প্রচ্ছদ : শ্রী সুরঞ্জন বসু

আনন্দবাজার, ১৯৯৭ উপলক্ষে

আশ্রম সম্মিলনী, পাঠভবন, শান্তিনিকেতন কর্তৃক প্রকাশিত ।

শান্তিনিকেতনের

আনন্দবাজার

শান্তিনিকেতনের

আ ন ন্দ বা জা র

আশ্রম-সম্মিলনী

পাঠভবন। শান্তিনিকেতন। ১৯৯৭

নিবেদন

ক'দিন পরে মহালয়ার দিনে আমাদের প্রিয় উৎসব 'আনন্দবাজার'। তাই, এবার আশ্রম-সম্মিলনীর দোকানের বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রতিনিধিরা একত্র হয়েছিলাম কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছে। সেখানে একটি প্রস্তাব এল — শান্তিনিকেতনের সুপ্রাচীন এই আনন্দবাজার উৎসব বিষয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করলে ভালো হয়। প্রস্তাবটি সেদিন উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করলেও বুঝতে পারিনি এটিকে কাজে পরিণত করতে গিয়ে এত আনন্দ পাব। সেই সঙ্গে নিজেরা এই উৎসব সম্পর্কে অনেক নতুন কথা জানতে পেরেছি। মনে হয়, আমাদের মতো অনেকেই জানতে পারবেন।

এই সংকলনটি তৈরি এবং প্রকাশ করার কাজে অনেকের কাছ থেকে মূল্যবান সহায়তা পেয়েছি। তাঁদের সকলকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই। বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষ মহাশয়ের আন্তরিক সহায়তার কথা স্মরণ করি। শিল্পী নন্দলাল বসুর আঁকা আনন্দবাজারের একটি অপ্রকাশিত ছবি মুখপাতে ছাপা হ'ল। শ্রদ্ধেয় শ্রী অমিতাভ চৌধুরী মহাশয় তাঁর একটি রচনার অংশ ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে এবং শ্রদ্ধেয় শ্রী সুরঞ্জন বসু মহাশয় প্রচ্ছদটি সাজিয়ে এই সংকলনটির গৌরব এবং শ্রী বৃদ্ধি করেছেন। আশা করি, এই প্রাক্তন ছাত্ররা আমাদেরই মতো আনন্দিত।

পুস্তিকাটি বিক্রি ক'রে লাভের অংশ সেবাবিভাগে জমা দেওয়া হবে। আশা রাখি, যাঁরা এটি সংগ্রহ করবেন, তাঁরা শুধুই সেবাবিভাগকে সাহায্য ক'রে আনন্দ পাবেন তা নয়, এই পুস্তিকাটি নিজেও তাঁদের কিছু বাড়তি আনন্দ দিতে পারবে।

আমাদের অনভিজ্ঞতাজনিত অনিচ্ছাকৃত কোনো ত্রুটি থাকলে সেজন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

আন্তরিক শ্রদ্ধাসহ,
বিনীত
সাধারণ সম্পাদক : প্রদীপ পাল
সাধারণ সম্পাদিকা : শ্রুতি নাহা
আশ্রম-সম্মিলনী, পাঠভবন, শান্তিনিকেতন।

24 সেপ্টেম্বর 97

সূচি

রবীন্দ্রনাথের চিঠি ৭

আনন্দবাজার-সংবাদ : 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা', ১৩২৬ বৈশাখ ॥ ৯

আনন্দবাজারের পুরনো কথা ॥ অনাথনাথ দাস ১০

একদিন-কা-মেলা ॥ অমিতাভ চৌধুরী ১২

আমাদের সময়ের আনন্দবাজার ॥ ক্ষমা ঘোষ ১৮

আনন্দবাজার ॥ সুপ্রিয় ঠাকুর ১৯

আমাদের মেলা ॥ গৌরী টুডু (তৃতীয় শ্রেণী) ২২

আমাদের আনন্দবাজার ॥ নিখিলেশ ভট্টাচার্য (দশম শ্রেণী) ২৩

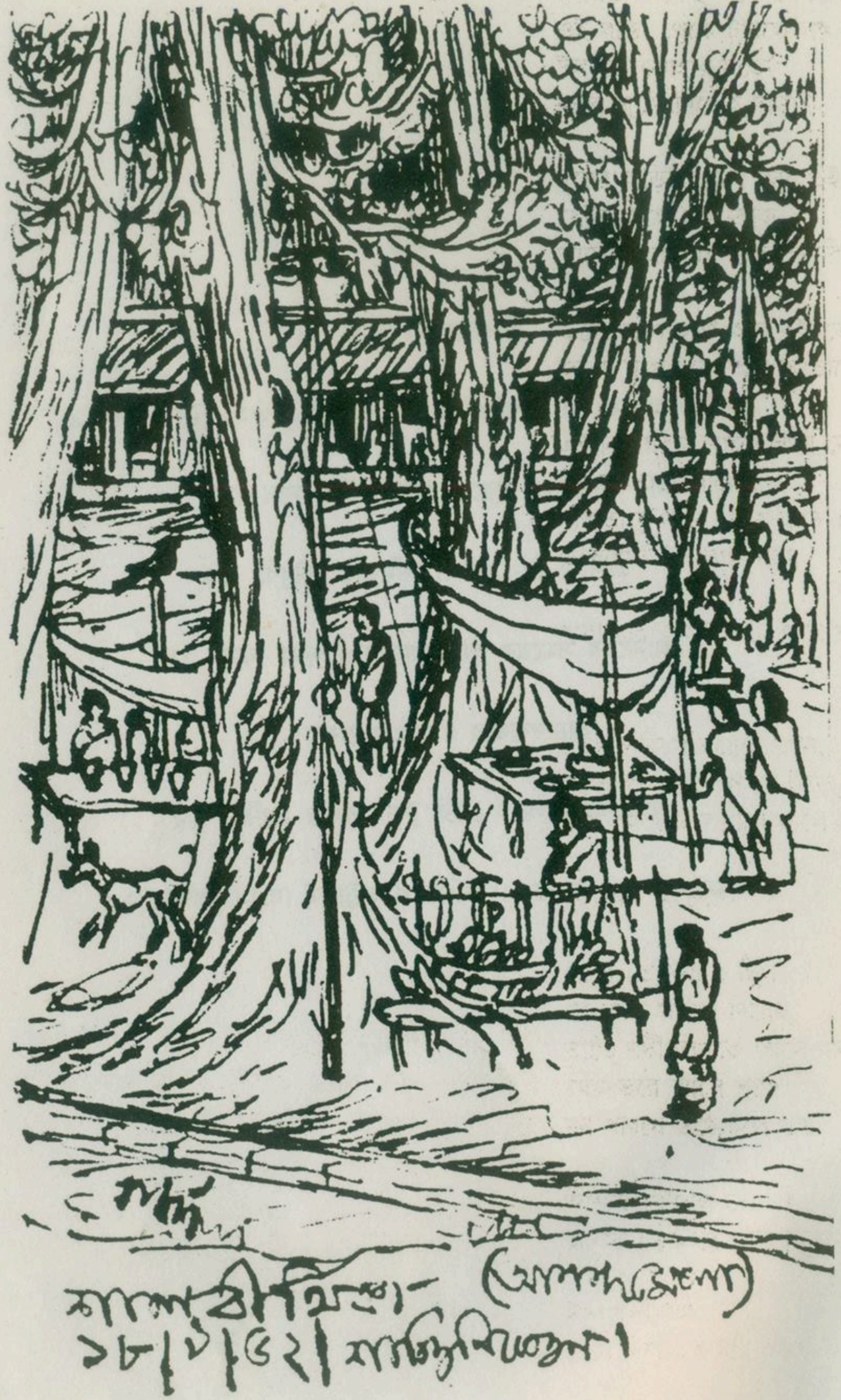

রবীন্দ্রনাথের চিঠি

শান্তিনিকেতন

তুমি ভাবছ— মজা কেবল তোমাদেরই হয়েছে তাই তোমাদের ইস্কুলের প্রাইজের মজার ফর্দ আমাকে লিখে পাঠিয়েছ, কিন্তু এত সহজে আমাকে হার মানাতে পারছ না। মজা আমাদের এখানেও হয় এবং যথেষ্ট বেশি করেই হয়। আচ্ছা, তোমাদের প্রাইজে কত লোক জমেছিল ? পঞ্চাশ জন ? কিন্তু আমাদের এখানে মেলায় অন্ততঃ দশ হাজার লোক তো হয়েইছিল। তুমি লিখেছ, একটি ছোটো মেয়ে তার দিদির কাছে গিয়ে খুব চীৎকার করে তোমাদের সভা খুব জমিয়ে তুলেছিল— আমাদের এখানকার মাঠে যা চীৎকার হয়েছিল তাতে কত রকমেরই আওয়াজ মিলেছিল, তার কি সংখ্যা ছিল। ছোটো ছেলের কান্না, বড়োদের হাঁকডাক, ডুগডুগির বাদ্য, গোরুর গাড়ির ক্যাঁচকোঁচ, যাত্রার দলের চীৎকার, তুবড়িবাজির সোঁ সোঁ, পটকার ফুটফাট, পুলিস-চৌকিদারের হৈ হৈ— হাসি, কান্না, গান, চেঁচামেচি, ঝগড়া ইত্যাদি ইত্যাদি। ৭ই পৌষে মাঠে খুব বড়ো হাট বসেছিল— তাতে গালার খেলনা, ফলের মোরব্বা, মাটির পুতুল, তেলে-ভাজা ফুলুরি, চিনেবাদাম ভাজা প্রভৃতি আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিস বিক্রি হল। এক-এক পয়সা দিয়ে ছেলেমেয়েরা সব নাগরদোলায় দুলল; চাঁদোয়ার নীচে নীলকণ্ঠ মুখুজ্যের কংসবধ যাত্রার পালা গান হচ্ছিল— সেইখানে একেবারে ঠেলাঠেলি ভিড়। তার পরে ৯ই পৌষে আমাদের মেয়েরা আবার এক মেলা করেছিলেন— তাতে সিঙারা, আলুর-দমের দোকান বসিয়েছিলেন — এক-একটা আলুর-দম এক-এক পয়সায় বিক্রি হল। সুকেশী বউমা চিনে-বাদামের পুতুল গড়েছিলেন, তার এক-একটা ছ-আনা দামে বিক্রি হয়ে গেল। কমল কাদা দিয়ে একটা ঘর বানিয়েছিল— তার খড়ের চাল, চারি দিকে মাটির পাঁচিল, আঙিনায় শিব-স্থাপন করা আছে— সেটা কেউ কিনতে চায় না, তাই কমল আমাকে সেটা জোর করে তিন টাকায় বিক্রি করেছে। ভেবে দেখো— কী রকম ভয়ানক মজা। ছোটো মেয়েরা একটুকরো নেকড়া ছিঁড়ে তার চারি দিকে পাড় সেলাই করে আমার কাছে এনে বললে, 'এটা রুমাল, এর দাম আট আনা, আপনাকে নিতেই হবে' বলে সেটা আমার পকেটে পুরে দিলে— এমন ভয়ানক মজা ! ওঁদের বাজারে এইরকম শ্রেণীর সব ভয়ানক মজা হয়ে গেছে— তোমরা যে-সব প্রাইজ পেয়েছ, সে এর কাছে কোথায়

লাগে। তার পরে মজা— মেলা যখন ভেঙে গেল, সমস্ত রাত ধরে চেঁচাতে চেঁচাতে বেসুরো গান গাইতে গাইতে দলে দলে লোক ঠিক আমার শোবার ঘরের সামনের রাস্তা দিয়েই যেতে লাগল— মজায় একটুও ঘুম হল না— নীচে যতগুলো কুকুর ছিল, সবাই মিলে ঊর্ধ্বশ্বাসে চেঁচাতে লাগল, এমন মজা। তার পরে কলকাতার অনেক মেয়ে তাঁদের ছোটো ছেলেমেয়ে নিয়ে এসেছিলেন— তাঁদের কারো কাশি, কারো জ্বর। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রাইজে এমন ধুমধাম, গোলমাল, কাশি-সর্দি, অসুখ-বিসুখ, আট আনায় রুমাল বেচা প্রভৃতি হয় নি— অতএব আমারই জিত রইল।

'ভানুসিংহের পত্রাবলী', পত্র ৩০।

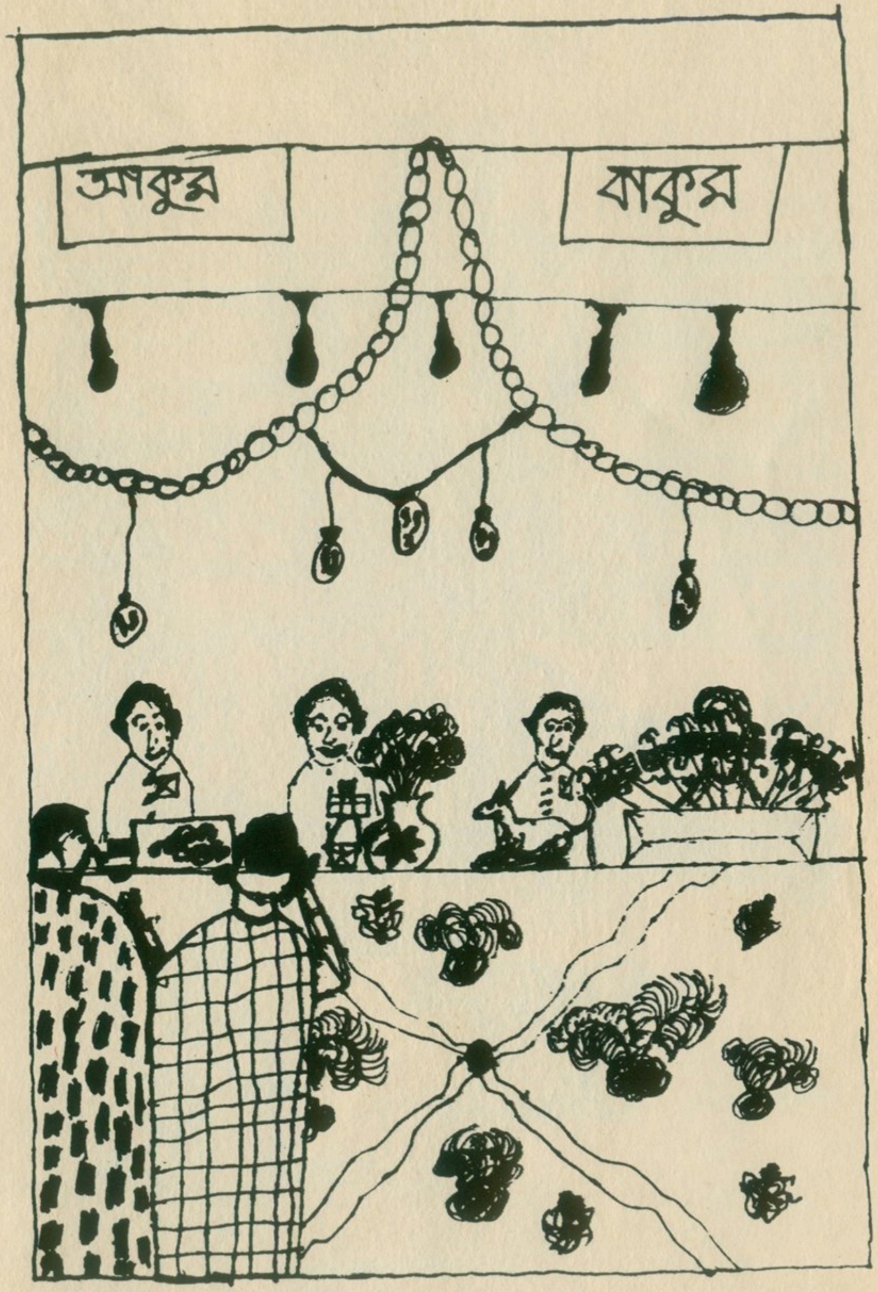

অর্ণব বসু পঞ্চম শ্রেণী

রাজেশ সিং দশম শ্রেণী

‘শান্তিনিকেতন পত্রিকা’

১৩২৬ বৈশাখ সংখ্যা থেকে

গত ২রা বৈশাখে শালের ছায়াবীথিতে, ছাত্রদের একটী আনন্দবাজার বসিয়াছিল। ছাত্রেরা নিজেরাই নানারকম খাবার দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দোকান করিয়াছিল। জনৈক ছাত্র নানাবিধ গাছের কাঁটা সংগ্রহ করিয়া একটি পরিদর্শনী খুলিয়াছিল। যে সব ছাত্র গান গাহিতে জানে তাহারা প্রত্যেকে দোকানে দোকানে গান গাহিয়া পয়সা সংগ্রহ করিয়াছিল। আর-একদল ছেলে এক প্রত্নতত্ত্বাগার খুলিয়াছিল। সেখানে ‘রামের পাদুকা’ (অর্থাৎ শ্রদ্ধেয় প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দবাবুর পাদুকা), অশোকের হস্তলিপি (জনৈক বর্ত্তমান ছাত্রের নাম অশোক), বুদ্ধের পাদনখকণা (জনৈক বর্ত্তমান ছাত্রের নাম বুদ্ধ দাস) ইত্যাদি। প্রত্যেক দোকানদারের লাভের অংশ অর্দ্ধেক দরিদ্র ভাণ্ডারে আর অর্দ্ধেক পত্রিকা-বিভাগের তহবিলে দেওয়া হইবে।

আনন্দবাজারের পুরনো কথা

অনাথনাথ দাস

আনন্দবাজার ছাড়া পুজোর ছুটির কথা ভাবাই যায় না। মহালয়ার আগের দিন থেকে প্রস্তুতি আর মহালয়ার সেই কোন্ ভোরে শালবীথি-ঘন্টাতলা-গৌরপ্রাঙ্গণ জুড়ে নিজেদের হাতে দোকান তৈরি থেকে আরম্ভ ক'রে, বিকিকিনির পাট চুকিয়ে রাত্রে আবার যখন সব গুটিয়ে ফেলতে হয়, তখন দুঃখ-আনন্দ-ছুটি সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

এই আনন্দবাজারের একটা ইতিহাস আছে, সংক্ষেপে জেনে রাখা ভালো।

আনন্দবাজারের সূচনার সঠিক তারিখ এখনও বলা যাচ্ছে না। সীতা দেবীর 'পুণ্যস্মৃতি' বইয়ে দেখা যাচ্ছে, ১৩২৪ সালে নববর্ষের দিন ছেলেদের আনন্দবাজার হয়েছিল। পরের বছর অর্থাৎ ১৩২৫ সালের ৯ পৌষ মেয়েদের আনন্দবাজার বসেছিল নিচু বাংলায়। 'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সীতা দেবীর লেখা থেকে আর পুরোনো হিসেবের খাতা থেকেও জানা যাচ্ছে, তখন এর নাম ছিল 'বউ ঠাকুরানীর হাট'। দেখা যাচ্ছে, বাড়ির গৃহিণীরা এবং একটু বড়ো মেয়েরা, ঠিক তোমাদের মতো তাঁরাও নানারকম পণ্য সাজিয়ে দোকান দিয়েছিলেন। সীতা দেবী 'পুণ্যস্মৃতি' বইয়ে এই মেলার চমৎকার একটি বিবরণ দিয়েছেন :

"হট্টগোল হইল প্রচুর। জনসমাগমও শান্তিনিকেতনের পক্ষে বেশ ভালোই হইয়াছিল। সন্ধ্যার সময়ই জমিল সবচেয়ে বেশি।... সুকেশী দেবীর বালক-ভৃত্য লক্ষ্মণের গলায় ঝুলানো মস্ত এক প্ল্যাকার্ডে 'শীঘ্র আসুন, শীঘ্র আসুন, বউ ঠাকুরানীর হাটে' লিখিয়া, ছেলেটাকে আশ্রম ঘুরিতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। ছেলের দল এইবারে সদলে আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত সরবে এবং সানন্দে মেলা চলিতে লাগিল। তাহার পর যে যাহার দোকানপাট তুলিয়া বাড়ি ফিরিয়া গেলাম।"

পরের বছর ১৩২৬ সালের ২ বৈশাখ বিদ্যালয়ের ছাত্ররা শালবীথিতে আনন্দবাজারের আয়োজন করে। এর কথাও সীতা দেবী লিখেছেন। ছেলেরা

কত তুচ্ছ জিনিস সুন্দর ক'রে সাজিয়ে আশ্রমবাসীদের মন আনন্দে পরিপূর্ণ ক'রে দিয়েছিল।

এর পর আনন্দবাজারের সময় নির্ধারিত হয় মহালয়ার দিন। ঠিক কবে থেকে এই দিনে আনন্দবাজার আরম্ভ হয় সঠিকভাবে এখনো ধরা যায়নি।

রবীন্দ্রনাথ তোমাদের হাতেই এই আনন্দবাজারের দায়িত্ব দিয়ে ভারি খুশি হয়েছিলেন। রাণু মুখোপাধ্যায়কে লেখা তাঁর চিঠির মধ্যে এই আনন্দবাজারের কথা আছে। অনেকেই নিশ্চয় পড়েছ। প্রথম দিকে আনন্দবাজার ছিল পাঠভবনের ছাত্রছাত্রীদের, পরে একটু-একটু ক'রে বিভিন্ন সময়ে যোগ দেয় অন্যান্য ভবনের ছাত্রছাত্রীরা। তবুও সেই প্রথম যুগ থেকে আজও তোমাদেরকে কেন্দ্র ক'রেই এই আনন্দের বাজার।

একদিন-কা-মেলা

অমিতাভ চৌধুরী

ঋতু উৎসব ও নাটক বাদ দিলে বড় দুটি উৎসব—আনন্দবাজার ও পৌষ উৎসব।...

এবারে আনন্দবাজারের কথা বলি। কবি নিশিকান্ত অনেকদিন আগে গান বেঁধেছিলেন আনন্দবাজার নিয়ে। শান্তিনিকেতন ছেড়ে পণ্ডিচেরির বাসিন্দা হওয়ার পরও সেই গান চালু ছিল বিশ্বভারতীর ছাত্রদের মুখে মুখে। 'চল চল দেখবে মজা আনন্দবাজারে, ছেলেমেয়ে বেচে কেনে কাতারে কাতারে।'...

আগে বুঝতে পারিনি এখন বুঝেছি, এই আনন্দবাজার ব্যাপারটা রবীন্দ্রনাথের বিদেশীকে স্বদেশী করার আর একটি দৃষ্টান্ত। 'ফেট' ব্যাপারটাকে দিয়েছেন নতুন রূপ, বানিয়েছেন পুরোপুরি ভারতীয় এবং ওর গায়ে যে কোন বিলিতি গন্ধ আছে, আজ তা বোঝার উপায় নেই। মেলার অন্তে লাভের টাকা সৎ কাজে খরচ করার মূল নীতিটুকু কিন্তু একই আছে।

আনন্দবাজার অভিনব। বার্ষিক পৌষ মেলার খুদে সংস্করণ। তার মেয়াদ একদিনের। ধরা বাঁধা দিন নেই। পুজোর ছুটির ঠিক আগটায় শরৎকাল যখন আসর জমিয়ে বসে শিউলি গাছের তলায়, কাশফুলের আগায়, নীল আকাশে শাদা মেঘের ভেলায়, ঠিক যখনই বাজে ছুটির বাঁশি, সেই সময়টায় বসে আনন্দবাজার।

এই একদিন-কা-মেলার ক্রেতা-বিক্রেতার ঠিকাদার ডেকরেটার ছাত্রছাত্রীরা। পুরনো লাইব্রেরি আর সিংহসদনের মাঝখানে গৌরপ্রাঙ্গণে বসে সারি সারি দোকান। প্রাককুটিরের বারান্দা, সত্য কুটির, শমীন্দ্র কুটির, পুরনো ঘণ্টাতলা, পূর্ব তোরণ, পশ্চিম তোরণ— কোন কিছুরই সম্মুখভাগ বাদ যায় না। কোন দোকান একার, কোনটি দলের, কোনটি বিভাগের। পাঠভবন শিক্ষাভবন বিদ্যাভবন কলাভবন সংগীতভবন— সকলেরই আলাদা আলাদা। এবং আলাদা ব'লেই চলে ভবনে ভবনে জোর প্রতিযোগিতা।

বেশিরভাগই খাবার দোকান। তাছাড়া থাকে সার্কাস, ম্যাজিক, জ্যোতিষী, লটারি, বন্দুকের তাক, খেলনার, ফুলের, হাতের কাজের দোকান। একমাস আগে থেকে চলে জোর প্রস্তুতি। কে কী করছে সবই গোপন রাখার চেষ্টা হয়। বিকিকিনির পর খরচা বাদে যার যা লাভ হয় সব জমা পড়ে কর্তৃপক্ষের

হাতে। সব টাকা যায় দরিদ্র ভাণ্ডারে। যে যত বেশি দিতে পারে তার তত আনন্দ—সবার কাছে জয়জয়কার।

মেলার দিন ভোরবেলা থেকে ব্যস্ততার সীমা থাকে না। বাড়ি থেকে হস্টেল থেকে ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে পড়ে সাজসরঞ্জাম নিয়ে। আগে থেকেই দড়ি বেঁধে নিজের নিজের জায়গা হয় বরাদ্দ। শামিয়ানা তেরপল বাঁশে চটপট উঠে যায় দোকানঘর। আসে টেবিল চেয়ার তক্তাপোষ শাড়ি ফুলদানি হাতা বেড়ি খুন্তি ডেকচি ইত্যাদি ইত্যাদি।

দুপুর বারোটার পর গৌরপ্রাঙ্গণের চেহারা আলাদা। একেবারে অন্য জগৎ। বিচিত্র নামের সব বিচিত্র দোকান যত্রতত্র মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। পর্দার আড়ালে একদল মেয়ে বসেছে খাবার বানাতে। চপ কাটলেট স্যাণ্ডুইচ পিঠে কেক সরবৎ অনেক কিছু। ছেলেরা টেবিল সাজাচ্ছে, পেরেক মারছে, বেঞ্চি টানছে। একদল ছোট্ট মেয়ে উত্তরায়ণের ফুলবাগান সাবাড় ক'রে মালা তৈরি ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে ফিরি করতে। সং বেরিয়েছে দু-চারজন। আলখাল্লা পরা আর রুদ্রাক্ষের মালা গলায় যে ফকিরের ছদ্মবেশে ব'সে আছে সেগুনতলায়, অনেকক্ষণ পরে বোঝা গেল সে পরিচিত একটি ছেলে। একগাদা গয়না আর মাথায় লাল রুমাল বেঁধে যে জিপসী মেয়ে চাকু বিক্রি করছে, অদ্ভুত সব কথা বলছে, তাকে চিনতে ডাকার দরকার পড়ে শার্লক হোমসের। ফিরিওয়ালায় ছয়লাপ। মেদিনীপুরের বন্যায় ভিখমাগা দলের মতো ডি এল রায়ের সুরের ধরনে একদল ছেলেমেয়ে বিচিত্র পোশাক পরে গানের মিছিল বের করেছে শালবীথির রাস্তায়। মৌনীবাবা এক সাধু ব'সে আছেন পুরনো ঘণ্টাতলায়। পকেটমারের ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে দু-চারজন।

আসলে পকেটমার অবশ্য খাবার দোকানগুলো। এক টাকার জিনিস তিন টাকা দর হাঁকতে লাজলজ্জা নেই। লক্ষ্মীকাটরা গণেশকাটরার মতো দোকানগুলোর নাম হওয়া উচিত 'গলাকাটরা'। তাছাড়া খাবারের নামগুলোও হয় মজার। কোথাও ফারসি কোথাও তামিল কোথাও সংস্কৃত। ওইসব ডেভিল বিরিয়ানি পানতুয়া নামের বালাই নেই। ছোলার পিঠের নাম চনক-ঘন, স্যাণ্ডুইচ বালুকণা জাদুকরী। অবস্থা এমন দাঁড়ায় পরিবেশনকারীদেরও নাম নিয়ে গণ্ডগোলে পড়তে হয়। তাই মেনু কার্ডের পেছনে লেখা থাকে খাবারের আসল নাম। নইলে সমূহ বিপদ। কেক খাবেন ভেবে আপনি অর্ডার দিলেন 'দাও তো হে চারখানা কৈকেয়ী'— পরিবেশক নিয়ে এল ঘুগনি।

আমরা যখন কলেজের ছাত্র, সব খাবারের নাম একবার দিয়েছিলাম তামিল ভাষার অনুকরণে। কোনটা হেৎরে উণ্ডা, কোনটা গাড্ডে মাড্ডে,

কোনটা এড়া ইল্লে, কোনটা পদম্পরম। খদ্দের পাকড়াতে আমরা একদল ছেলে দোকানের বাইরে চোঙ্গা লাগিয়ে কোরাসে চিৎকার পাড়ি— হেৎরে উণ্ডা, গাড্ডে মাড্ডে, তৎক্ষণাৎ দলের মেয়েরা ধুয়া ধরে— এড়া ইল্লে, পদম্পরম। এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ চিৎকারের জোরেই আমরা অনেক খদ্দের টেনেছিলাম। খাবার খেয়ে কোন ক্রেতাই যে সন্তুষ্ট হননি এ কথা হলফ করে বলতে পারি। তাছাড়া একটা ছোট্ট সিঙ্গাড়ার নাম যদি হল কুডুমুডু তিরুকোণ তিরুভূজমূর্তিম এবং তার দাম যদি হয় সাড়ে আঠারো আনা, তাহলে ফরাসী শেফ আনিয়ে খাবার বানালেও বিস্বাদ লাগবে; অবশ্যি সব দোকানেই এক হাল। খাবারের সাইজ যত ছোট দাম তত বড়। একবার একটি দোকানের নাম ছিল ঋণংকৃত্বা। বোঝা যায়নি দোকানীরা ঋণ করে দোকান করল, না ঋণ করে খেতে আসতে প্রলুব্ধ করছে।

মাস্টারমশাই বা আশ্রমের বাসিন্দা অভিভাবকদের আবার বাড়তি বিপদ। একটি দোকানে গিয়ে নিস্তার নেই। চেনা প্রায় প্রত্যেকটি দোকানেই ঢুকতে হবে এবং দফায় দফায় টাকা গচ্চা দিতে হবে। যিনি যত জনপ্রিয়, তত বেশি ডাক, তত বেশি গচ্চা। বাইরে থেকে যাঁরা যান, তাঁরা মনোহারিণী, বিচিত্ররূপিণী পরিচারিকাদের দেখে বিপদসমুদ্রে ঝাঁপ দেন। পরিচারক পরিচারিকাদের সাজ-পোশাক দোকান ও খাবারের নামের ভাষার সঙ্গে মিলিয়ে করা হ'ত। সংস্কৃত হ'লে উজ্জয়িনীর মালবিকা নিপুণিকা ঘুরে বেড়াত। ফারসী হ'লে লায়লা মালেকা আবিদারা চোখে বিদ্যুৎ হানত। এ আকর্ষণও কম নয়। তাছাড়া আর একটি গোপন কথা জনান্তিকে বলি। প্রত্যেক টেবিলে পরিবেশনে থাকে একটি ছেলে একটি মেয়ে। সেই জোড়া ঠিক করতে বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়, মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়। শেষ পর্যন্ত লটারি ক'রে যার অদৃষ্টে যেমন জুটেছে। শুধু তাই নয়, নেপথ্যে খাবার তৈরির জায়গায়ও উৎসাহ প্রবলতর হয়— উৎসাহদাত্রী সঙ্গীটি যদি পছন্দসই হয়।

এই আনন্দবাজারের শুরু শান্তিনিকেতনের সেই আদ্যিকাল থেকে।... প্রথমবারে রবীন্দ্রনাথ গরহাজির। তিনি তখন জাপানে। পরের বার থেকে তিনি শান্তিনিকেতনে থাকলে আনন্দবাজারে যেতেনই এবং চড়া দামের হাত থেকে তিনিও রেহাই পেতেন না। রবীন্দ্রনাথ সাধারণত লটারি, পুতুলের দোকান, ফুলের দোকান ইত্যাদিতে যেতেন। তাঁর উপস্থিতি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নতুন উৎসাহ এনে দিত। 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'তে শ্রীমতী রাণু মুখোপাধ্যায়কে লেখা এক চিঠিতে আনন্দবাজারে তাঁর আনন্দ করার এক বিবরণ আছে। এবং চার আনার রুমাল এক টাকায় কেনার কাহিনীও তিনি বর্ণনা করেছেন চিঠিতে।

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এলে খুশি হ'ত ক্রেতা ছাত্রছাত্রী এবং বিক্রেতা ছাত্রছাত্রী। দিলদরিয়া এই বিপুলবপু মানুষটি অকাতরে পয়সা খরচ করতেন এই খুদেমেলায় এসে। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে খাবার দোকানে ঢুকলে দাম যত চড়াই হোক না কেন, গাঁটের কড়ি গচ্চা দিতে হ'ত না অন্য কারও। শুনেছি জুতো বুরুশের কাজে নেমে একটি ছাত্র পুরো এক টাকা আদায় করেছিল দিনেন্দ্রনাথের কাছ থেকে।

আগে আনন্দবাজার বসত শালবীথি আম্রকুঞ্জ ঘিরে। এখনকার মতো গৌরপ্রাঙ্গণকে কেন্দ্র ক'রে নয়। প্রথমবারে মাধবী-বিতানে— যেখানে জগদানন্দ রায় অঙ্কের ক্লাস নিতেন— সুধাকান্ত রায়চৌধুরী এক খাবারের দোকান দিয়েছিলেন। মুখে উর্দু, পরনে পশ্চিমি পোশাক। পাগড়ি শিলওয়ার আচকান। খাবার একটিই— কাঁচালু। আলুকাবলির ধরণে তেঁতুলজল মেশানো কাঁচা একটি আলুর গায়ে চোরকাঁটা। অঢেল বিক্রি হয়েছিল সেবার। খাবারের উৎকর্ষের জন্যে নয়, দোকানীর উর্দু বয়েৎ আর মুসলমানি আদবকায়দার জোরে।

১৯৫২ সালে এই আনন্দবাজারেই আমি একটি ছড়ার দোকান দিয়েছিলাম। নাম অন্নপূর্ণা কবিতা ভাণ্ডার। সাইনবোর্ডের নিচে লেখা ছিল — এখানে সুলভে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফরমায়েশ-মতো কবিতা লেখা হয়। অর্ডিনারি চারি আনা, স্পেশাল আট আনা। সাইনবোর্ড লিখে ও এঁকে দিয়েছিলেন রানী চন্দ। সাইনবোর্ডের উপরে ছিল সিদ্ধিদাতা গণেশের ওল্টানো ছবি। ক্যাপশন : উল্টা গণেশায় নমঃ।

দোকানের সামনে কাউন্টারে বসেছিল আমার দুই অ্যাসিস্ট্যান্ট— অমর্ত্য সেন এবং তাঁর সহপাঠী ও বর্তমানে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির খ্যাতনামা অধ্যাপক মৃণাল দত্তচৌধুরী। ছিল একজন রিসেপশনিস্ট— মঞ্জুলা দত্ত।

কাউন্টারের পেছনে এক ঘেরাটোপের মধ্যে ছিল ফ্যাক্টরি— কবিতা রচনার কারখানা, অর্থাৎ কাগজ-কলম নিয়ে আমি ব'সে আছি। অমর্ত্য মৃণাল চেঁচিয়ে খদ্দের জোগাড় করে, মঞ্জুলা অর্ডার নেয় এবং নাম বা বিষয়, স্পেশাল না অর্ডিনারি— একটা চিরকুট লিখে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। ঘড়িধরা পাঁচ মিনিটের মধ্যে অর্ডারমাফিক ৮৭টি ছড়া লিখেছিলুম সেবার। তারপর মাথা এমন ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগল, দোকানপাট ফেলে পালিয়েছিলাম এক খাবারের দোকানে। ঝর্ণা বসু, বরেন সেন, কল্যাণী চৌধুরী, সেফি চন্দ, মালবিকা বসু, অনিমা ঘটক, গীতা গাঙ্গুলি আড্ডা মারছিল আর অদ্ভুত কোন নামের খাবার খাচ্ছিল। আমাকে ওরা ডেকে নিল এবং মাথা ঝিম্‌ঝিম্ বন্ধ হ'ল।

আমার খদ্দেরদের মধ্যে ছিলেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডক্টর প্রবোধ বাকচি, অনিলকুমার চন্দ, রানী চন্দ, সেকালের চিত্রতারকা সুপ্রভা মুখার্জি, পরবর্তীকালে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট দেবকান্ত বরুয়া, শান্তিদেব ঘোষ প্রমুখ। দেবকান্ত বরুয়া সম্পর্কে দু'লাইন মনে আছে—

গড়িয়ে চলেন গড়িয়ে বলেন
গড়গড়ানো ভাব,
নিন্দুকেরা নাম দিয়েছে
নরম কচিডাব।

ডঃ প্রবোধ বাকচি যখন এলেন, মিলের খাতিরে তাঁকে 'সাকচি' পাঠিয়ে শেষ করলাম 'ত্রাহি ত্রাহি ডাকছি' দিয়ে। সুপ্রভা মুখার্জির সম্পর্কে লেখা ছড়া পরে অন্যভাবে লিখে অন্যত্র ছাপিয়েছি। সেবার লিখেছিলাম—

হাসির ঝিলিক ছড়িয়ে দিয়ে
মিষ্টিমধুর সম্ভাষণ,
ঠোঁটের রঙে শাড়ির রঙে
জি সি লাহার বিজ্ঞাপন।

'শান্তিদেব ঘোষ, একটুতেই ফোঁস'— এই কথাটি লেখাতে শান্তিদা আমার উপর ফোঁস ক'রে ওঠেন নি, কিংবা অনিলকুমার চন্দের 'গায়ে বদ গন্ধ' দেওয়াতেও অনিলদা ক্ষুণ্ণ হন নি। বুঝেছিলেন সবই মিলের খাতিরে। তবে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিপদে ফেলেছিলেন আমাকে। স্পেশাল আট আনা ফেলে দিয়ে ফরমাশ করলেন 'আমার নামে চাই চৌপদী'। চৌপদী লেখার হাঙ্গামা অনেক। আমি ছোট চারটি পদ তৎক্ষণাৎ লিখে বললাম, এটাই চৌপদী—

রথীন্দ্রনাথ,
আজ তার সাথ
মোর মোলাকাৎ
আমি কুপোকাৎ

আর একজন খদ্দের এসে ফরমাশ দিলেন, 'কম্যুনিটি প্রজেক্ট' নিয়ে ছড়া বানাতে হবে। তখন দেশে সবে চালু হয়েছে এই প্রজেক্ট। আমার মাথায় বজ্রাঘাত। কী লিখি? হাতে সময় পাঁচ মিনিট। সময় পেরোলেই পয়সা বাতিল। অবশেষে মাথার চুল ছিঁড়ে কলম কামড়ে অতি কষ্টে লিমেরিক লিখলাম—

জ্যেসমিন নাহার বেগম সপ্তম শ্রেণী

পৌলোমী পাল ষষ্ঠ শ্রেণী

প্রজেক্ট কম্যুনিটি
নামটা খিটিমিটি।
ঢালছে টাকা দেদার
রামা, শ্যামা কেদার
টাকায় লুটোপুটি।

আর এক খদ্দের ফরমাশ দিলেন ভারতে মার্কিন সাহায্য নিয়ে ছড়া বানাতে হবে। ঠং ক'রে কাউন্টারে ফেলে দিলেন স্পেশাল রেট আট আনার আধুলি। ঘেরাটোপের ফাঁক থেকে দেখলাম ক্রেতাটি চেনা— কম্যুনিস্ট। তাঁকে খুশি করার জন্যে লিখলাম—

ডলার মোড়া চার কিনে
টোপ ফেলেছে মার্কিনে।
মিলে সকল পড়শিতে
আটকে গেছি বঁড়শিতে।
ডিসেম্বরের ভর শীতে।
রাত কাটাব জার্কিনে।

আরও অনেক ছড়া। সব মনে নেই। তা না থাকুক, আমাদের কালের আনন্দবাজারের স্মৃতি মনে গেঁথে আছে। সেই দোকান সাজানো, সেই খাবার বিক্রি, সেই সং সেজে রাস্তায় রাস্তায় নাচন কোঁদন— কোনদিন ভুলব না। ভুলব না, মেলার শেষে ফাঁকা দোকানে ব'সে আড্ডা মারা, গান গাওয়া। সারাদিনের ক্লান্তির পর কেউ মাটিতে, কেউ টেবিলে, কেউ বেঞ্চিতে হাত পা ছড়িয়ে বসেছি। তারই মধ্যে কেউ কেউ পয়সার হিসাব মেলাচ্ছে, কাপ প্লেট গুনছে। অন্য দোকান থেকে দল বেঁধে একে একে আসছে অন্য ভবনের ছেলেমেয়েরা, সবাই গোল হয়ে ব'সে পড়েছে। তারপর শুরু গান। গানের পর গান। গানের প্লাবন। একটানা কোলাহলের পর শালবীথি তখন চুপ। গৌরপ্রাঙ্গণ চুপ। সারাদেহে ক্লান্তি। পুরনো লাইব্রেরির বারান্দা থেকে ভেসে আসছে ছেলেমেয়েদের সম্মিলিত উদ্দাম কণ্ঠস্বর— 'আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল, ভবের পদ্মপত্রে জল— ।' এই গানের সুর এখনও কানে বাজে, এখনও হটাৎ বুকে চমক লাগায়।

'শান্তিনিকেতনে সুখের বারমাস্যা' (জানুয়ারি ১৯৮১) থেকে।

আমাদের সময়ের আনন্দবাজার

ক্ষমা ঘোষ

আনন্দবাজারের সবটাই খুব সহজ, সাধারণ। দোকান সাজানো হ'ত শাড়ি, বেডকভার ইত্যাদি দিয়ে। কোনরকম চকচকে ব্যাপার ছিল না।

একবারের ঘটনা মনে আছে— ১৯৪২-৪৩ সাল নাগাদ আমি তখন পাঠভবনে পড়ি। কলাভবন একটা তাঁবু খাটিয়েছিল। ছোট্ট তাঁবু, ভিতরে জায়গা কম, তার অর্ধেকটা জুড়ে স্টেজ। দশ-পনেরো জন বসতে পারে এরকম জায়গা। একটা বোর্ডের মধ্যে একজন চক্ দিয়ে একটানে একটা মুখ আঁকলো —হিটলারের বা এরকম কিছু। জয়াদি (জয়া আপ্পাস্বামী) পিছনে হাত দিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে আছেন, পিছনে আরেকজন—জয়াদি কথা বলছেন, অন্যজন হাত-পা নাড়ছেন, কমিকের মতন। প্রসন্ন রাও হাতের ছায়া ফেলে নানান রকম জিনিসের ছবি করতেন। কলাভবনে একবার পুতুল-নাচ হয়েছিল, কিঙ্করদা (রামকিঙ্কর বেইজ) সবাইকে সারা গায়ে রঙ মাখিয়ে পুতুল সাজিয়েছিলেন।

এখনকার মতো তখনও অনেক খাবারের দোকান হ'ত। আশ্রম-সম্মিলনী তো খাবারের দোকান। ছোট ছেলেমেয়েরা অনেক পুতুল বানাত এখনকার মতোই। ওদেরকে কেউ শিখিয়ে দিত না। নিজেরাই নানান রকম জিনিশ সংগ্রহ ক'রে খুব সুন্দর সুন্দর পুতুল বানাত। খুব সহজভাবে ওরা এই পুতুলগুলো বানায়। একবার গৌরীদি (শ্রীমতী গৌরী ভঞ্জ) ওঁর মেয়ে বাণীকে আর আমাকে পাতা আর ফুলের গয়না দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা অনেক পাতা, ফুলের গয়না ট্রে-তে ক'রে নিয়ে ফেরি ক'রে ক'রে বিক্রি করেছিলাম। শেষে নিজেদের গায়ের গয়নাগুলোও সব বিক্রি ক'রে দিয়েছিলাম।

খুব সহজে তৈরি করা জিনিশ নিয়ে, সাধারণভাবে সাজিয়েই আনন্দবাজার সুন্দর হ'ত।

আনন্দবাজার

সুপ্রিয় ঠাকুর

অবশেষে, মনে হচ্ছে শরৎকাল এসে পৌঁছাল। এবছর তারিখের হিসাবকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা ক'রে, নিজের সময়সীমা পেরিয়ে বর্ষা তার তাণ্ডব চালিয়ে গেল অনেকদিন। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি আর শেষই হতে চায় না। তারপর কোন জাদুকরের সোনার কাঠির ছোঁয়ায় এক নিমেষে মেঘ উড়ে গেল। সোনা রোদ্দুর ঝলমল ক'রে উঠল—শিউলি গাছের পাতার ফাঁকে একটি দুটি ক'রে ফুল উঁকি দিতে লাগল। এইবার সকালবেলা খালি গায়ে পথে বেরুলে শিশিরের পরশ পাওয়া যাবে— কোপাই নদীর দুই ধারে কাশের বন হাওয়ায় দুলবে। বাঙালির মন পূজার আনন্দে মেতে উঠবে। কিন্তু শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েদের কাছে মেঘমুক্ত আকাশ, আর শিউলি ফুলের গন্ধ আর এক সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হয়। আনন্দবাজার!

মহালয়ার দিন সূর্য ওঠার আগে রেডিওতে দেবীবন্দনা শুনে শেষ হওয়া মাত্র সবাই অপেক্ষা ক'রে থাকে—এই বুঝি ঢাকে কাঠি পড়ল। ঢাকের আওয়াজ শোনামাত্র হুড়োহুড়ি প'ড়ে যায়—এই বাঁশ নিয়ে আয়—শাড়ি দিয়ে দোকান ঘেরা শুরু ক'রে দে, দেবদারু পাতা পেড়ে আন। সবার আগে—সবার চেয়ে সুন্দর ক'রে দোকান সাজাতে হবে। এমন কি তার জন্য বড়দের চোখের আড়ালে খেলার মাঠ থেকে গোটা কয় লোহার বেড়ার অংশ যদি খুলে আনা যায় তাহলে মজবুত ক'রে দোকান বাঁধা যায়। পরে বকুনিটা হজম ক'রে নেওয়া যাবে।

শান্তিনিকেতনে তো একটি উৎসব শেষ না হতে আর একটি উৎসব এসে পৌঁছায়। তার মধ্যে আনন্দবাজার উৎসবটির এক স্বাতন্ত্র্য আছে। অন্যসব উৎসবের আয়োজন অন্যেরা করে—তাতে ছেলেমেয়েরা যোগ দিতে যায়। আর আনন্দবাজার উৎসব ছেলেমেয়েদেরই উৎসব। সেখানে কর্তৃত্ব তাদেরই।

কতদিন আগে থেকে জল্পনা-কল্পনা চলে। এবার হাতের কাজের পসরা না সাজিয়ে খাবারের দোকান। অথবা এবার ম্যাজিক দেখালে কেমন হয়! গতবার বেশি লাভ ক'রে জমা দিতে পারা যায়নি। এবার অন্যদের টেক্কা দিতে হবে। যারা হাতের কাজের দোকান দেবে— তাদের ব্যস্ততা আরম্ভ হয় সবার

আগে। কত সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরি হয়ে ওঠে দেখতে দেখতে— দড়ির ব্যাগ, মাটির পুতুল, আমলকির মালা, দেবদারুর বিচি দিয়ে তৈরি ছোট পোকামাকড়। এই হাতের কাজের নমুনা দেখে অবাক হয় বাইরের মানুষ—এ তো শান্তিনিকেতনের বাইরে আর কোন জায়গায় পাওয়া যাবে না।

আর আনন্দবাজারের লভ্যাংশ যাবে দুঃস্থদের প্রয়োজন মেটাতে— সেও তো কম কথা নয়।

শরতের সকালে এইসব কথা ভাবতে ভাবতে মনে প'ড়ে গেল নিজের পাঠভবনের ছাত্রাবস্থার দিনগুলির কথা। আশ্চর্য! সেদিনের শান্তিনিকেতন আর আজকের শান্তিনিকেতনে কত তফাৎ। ভিড় বেড়েছে, ঠেলাঠেলি অনেক — কিন্তু সেদিনের ছেলেমেয়েদের মন আর আজকের ছাত্রছাত্রীদের মনের খুব বেশি অমিল তো দেখি না। আনন্দবাজারের নেশা আমাদেরও তো মাতাল ক'রে রাখত— ঠিক আজও যেমন মাতাল করে এ যুগের ছেলেমেয়েদের।

সেদিন আমরাও দোকান করার জন্য দল বেঁধেছি, ক্যাপটেন বেছে নিয়েছি। মনোমতো দোকানের জায়গা না পেলে আমরাও রাগ করতাম, ঝগড়াও করতাম। আজকের ছেলেরা খেলার মাঠের বেড়া ভাঙে—আমরা চুরি ক'রে আনতাম বাঁশ। আনন্দবাজারের বেশ ক'দিন আগে থেকে খোঁজ প'ড়ে যেত কোথায় কোথায় নতুন বাড়ি হচ্ছে। আগের রাতে অথবা আনন্দবাজারের ভোর রাতে সেখান থেকে বাঁশ নিয়ে আসতে না পারলে তো আর দোকান বাঁধা যাবে না।

ছোটবেলায় হাতের কাজের দোকান দেওয়াই রীতি। তার জন্য কার্ড আঁকা, মাটির পুতুল গড়া শুরু হ'ত অনেকদিন আগে থেকে। ক্লাসে ব'সে নতুন কিছু করার একটা ঝোঁক সবারই থাকত। প্রথমবার যখন ডিমের খোলার পুতুল-বুড়ো বানিয়ে আনন্দবাজারে হাজির করা গেল—সে কী আনন্দ! এ জিনিস তো আর কেউ করতে পারেনি।

নতুন কিছু করার নেশাটা মাঝে মাঝে বেশ বিপদ্জনক হয়ে উঠত। একবার খেয়াল গেল পদ্মফুল তুলে এনে আনন্দবাজারে বিক্রি করতে হবে। আগে থেকে পুকুরের খোঁজ ক'রে রাখা হয়েছিল। আনন্দবাজারের ভোর রাতে একদল চ'লে গেল পদ্মফুল পেড়ে আনতে। কী ভয়াবহ বিপদ থেকে সেবার তারা বেঁচে ফিরেছিল ভাবতে আতঙ্ক হয়। কিন্তু পদ্মফুলের পসরা দেখিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবার সময় বিপদের কথা কারও মনেই ছিল না।

বয়স যখন একটু বাড়ল তখন হাতের কাজে আর মন উঠত না—খাবারের দোকান করা চাই। আমাদের সময় খাবারের দোকানে যদি বরফ দেওয়া লাল সবুজ সরবত না থাকত তাহলে সেটা নেহাৎ অপমানজনক ব্যাপার ছিল। অথচ বোলপুরে তখনও বরফের কল হয়নি। সুতরাং বর্ধমান থেকে ট্রেনে ক'রে কাঠের গুঁড়ো ঢাকা দিয়ে বরফ নিয়ে আসাটা নেহাৎ বড়রকমের অ্যাডভেঞ্চার ছিল।

আর ছিল নানা ছড়া আর ছবিতে সাজানো দোকানের পোস্টার তৈরি করা। এ ব্যাপারেও প্রতিযোগিতাটা বেশ জোরদার ছিল। এ তো গেল আনন্দবাজারের প্রস্তুতিপর্ব। আনন্দবাজারের দিনের নেশা তো আর এক রকমের। কী পোশাক প'রে যাওয়া হবে সেটা বেশ যত্ন ক'রেই বেছে রাখতে হ'ত। সেই সন্ধ্যাটিতে সাজগোজের নিষেধ তেমন ছিল না। তাই দেখা যেত অনেক ছেলেই লক্কা পায়রা সেজে দোকানে দোকানে হাঁক দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। আশ্চর্যের বিষয়, সেই লক্কা পায়রার দল কিন্তু অগোছালো জামাকাপড় অথবা বিশেষভাবে ছেঁড়া পাঞ্জাবির হাতা-ওয়ালাদের কাছে আসরে গিয়ে হার মানতে বাধ্য হ'ত। শান্তিনিকেতনের এই মেজাজটা কি হারিয়ে গেল? কে জানে?

মেয়েদের বেলায়ও তাই। আনন্দবাজারের দিনটির জন্য সযত্নে বাঁচিয়ে রাখা থাকত আনারসি বেনারসীর গোছা। এ ক্ষেত্রেও কেন জানি না—এলো খোঁপায় ফুলের কাছে ঠোঁটের সিঁদুরকে হার মানতে হ'ত।

সেই নেশায় এগিয়ে যেত সন্ধ্যা। হঠাৎ খেয়াল হ'ত সময় তো আর নেই। কালকে তো সবার বাড়ি চ'লে যাওয়ার দিন। যাকে যে কথা বলা হয়নি তা তো ব'লে নিতে হবে। কিন্তু বলা আর হ'ত না।

গৌরপ্রাঙ্গণ ফাঁকা ক'রে দিয়ে যে যার ঘরে ফিরে যাওয়ার পর প'ড়ে থাকত ছেঁড়া কাগজের রাশি—শুকনো ফুলের মালা আর বুক ভাঙা স্মৃতির বোঝা!

আমাদের মেলা

গৌরী টুডু

প্রতি বছরের মতো ১৯৯৬ সালে, যখন আমি নতুন এসেছিলাম, সেইবারও আনন্দবাজার হয়েছিল। আমি জানতাম না যে আনন্দবাজারে এত আনন্দ হয়। রানীদি ও বনানীদি আমাদের পঁচিশ টাকা ক'রে দিয়েছিলেন আনন্দবাজারে যাবার জন্য। আমরা বলাবলি করছিলাম কে কী কিনবেন। আমরা সন্তোষালয়ের মেয়েরাও একটা দোকান করেছিলাম। এইরকম অনেক দোকান ছিল পাঠভবন অফিসের সামনে। আশ্রম-সম্মিলনীর দোকানে অনেক রং করা মাটির টব আর ফুলদানী ছিল। সেগুলো দেখতে খুব সুন্দর। সেদিন আমার মা-বাবা এসেছিলেন। আমি অনেক কিছু খেয়েছিলাম। সবাই নতুন নতুন জামা প'রে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমি এই মেলাটির কথা জীবনে ভুলব না।

আমাদের আনন্দবাজার

নিখিলেশ ভট্টাচার্য

আনন্দবাজার সম্বন্ধে প্রথমেই একটু ধারণা দেওয়া যাক। আনন্দবাজার হচ্ছে বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের নিজের হাতে তৈরি একবেলার একটা ছোট মেলা। মেলার দোকান ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই তৈরি করে, ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, অধ্যাপিকার তত্ত্বাবধানে। মহালয়ার দিন গৌরপ্রাঙ্গণে আনন্দবাজার অনুষ্ঠিত হয়। মেলার লাভের অংশ যায় সেবা-বিভাগে।

পাঠভবন-জীবনের একটা বড়ো আকর্ষণ এই মেলা। গভীর আগ্রহে সবাই অপেক্ষা ক'রে থাকে এই দিনটির জন্য। এক মাস, কি তারও আগে থেকে শুরু হয়ে যায় প্রস্তুতি। কারা দল বেঁধে দোকান করবে, কে ভারপ্রাপ্ত হবেন, কিসের দোকান হবে এই নিয়ে কত তর্ক-বিতর্ক। ছোটদের দল তৈরি হয়, ভাঙে, আবার তৈরি হয়। খাবারের দোকান হ'লে বাড়ির অভিভাবকেরা শেষদিন অবধি হয়তো জানতেই পারলেন না কী রান্না করতে হবে। হাতের কাজের দোকান হ'লে যদিও খাটনিটা প্রায় পুরোটাই ছাত্রছাত্রীদের।

আনন্দবাজারে যদি কোনো কিছুর অভাব থাকে তবে তা হচ্ছে গোমড়া মুখ! রামগরুড়ের ছানাই হোক কি গোমড়াথেরিয়ামই হোক, আনন্দবাজারে এলে মুখে হাসি ফুটবেই। অদ্ভুত দোকানের নাম। সাধারণ খাবারকেও এমন কিম্ভূত নামে উল্লেখ করা হয় যে, না-খেয়ে উপায় থাকে না। আর বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরাই এত ভালো রান্না করেন যে কী বলব! তার ওপর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তৈরি খাবারে-ভরা আশ্রম-সম্মিলনীর দোকান তো আছেই। হাতের কাজ পাঠভবনের ছাত্রছাত্রীদের চিরকালই সুন্দর। হাতে আঁকা কার্ড, মাটির তৈরি জিনিসপত্র, ইত্যাদি দেখে অনেকেই মুগ্ধ হন। সবকিছুরই দাম যদিও সম্ভব অসম্ভবের সীমারেখায়। ক্রেতারা তবুও হাসিমুখেই সে দাম দেন।

সবচেয়ে মুশকিল ছোট ছোট বিক্রেতাদের নিয়ে। তাদের অবহেলা করলে ক্রেতার বারোটা বাজবে। তবে তারা অবহেলা করবার কোন সুযোগও দেয় না। ক্রেতাকে চারপাশ থেকে জড়িয়ে ধ'রে তার পকেটে পণ্যদ্রব্য জোর ক'রে ঢুকিয়ে দিয়ে তারা দাম চেয়ে বসবে। তাদের মুখে বিক্রি করার আনন্দের হাসি

দেখে ক্রেতারা জিনিসটার উপযোগিতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত থেকেই সেই দাম দিতে রাজি হয়ে যান।

আনন্দবাজার আমাদের এত আপন, কারণ সে আমাদের নিজেদের, সম্পূর্ণ নিজেদের। নিজেদের হাতে তৈরি দোকানে, নিজেদের তৈরি জিনিশ, নিজেদের তৈরি দামে নিজেদেরই মা-বাবা, চেনাশোনা মানুষদের কাছে বিক্রি করে ছাত্রছাত্রীরা। সবাই মেলায় যোগ দেয় এবং সবারই কোন-না-কোন ভূমিকা থাকে, সে বিক্রেতার ভূমিকাই হোক কি ক্রেতার। আর সেইজন্যই আনন্দবাজারকে আমরা সবাই এত ভালোবাসি।

—